IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বাংলা সাহিত্য ও ধীবর সংস্কৃতি

টুম্পা মণ্ডল

সভ্য সমাজ গড়ে ওঠার অনেক আগেই, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে বনে বসবাসকারী মানবসমাজের সময় থেকেই জেলে বা মৎসজীবী সমাজের উদ্ভব এমনটাই মত মার্কিন নৃতত্ত্ববিদ লুইস হেনরি মর্গান এর। তাঁর বিখ্যাত বই 'প্রাচীন সমাজ'-এ মানব সমাজের বিবর্তন প্রসঙ্গে তাঁর এরূপ দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশ পায়। জল যে আদিম জীবনের বাহন ছিল তা সাম্প্রতিক লেখকরাও স্বীকার করেন। "ভাঙার মানুষের একাংশের আদিম বাহন ছিল জল। আদিতে মানুষ ছিল আকর্ষণজীবী। পরে জীবনকে নিরাপদ নিশ্চিত এবং নিয়ন্ত্রিত করে তুলতে তারা হয়ে উঠেছিল কর্ষণজীবী। জলে ডাঙায় পৃথিবী জুড়ে এই একই তথ্যচিত্র।"

খাল, বিল, পুকুর, নদী, সমুদ্রে মাছ ধরা, বেচা ও বাঁচা এই নিয়েই যাদের জীবন যাপন তারাই জেলে। ভৌগলিক প্রাকৃতিক পরিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তনের কারণে জলাশয়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে জলজীবী সমাজ। অন্যদিকে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাছের চাহিদা বেড়েছে ফলে মৎস্যজীবী মানুষের সংখ্যা ও বৃদ্ধি পেয়েছে যারা আদতে মৎস্য ব্যবসায়ী। বাংলার মৎস্যজীবীরা জাতিতে মালো, নিকিরী, চুনুরী, পাটুনী, তিয়র, বাগদী, কৈবর্ত প্রভৃতি জাতির অন্তর্ভুক্ত। কৈবর্তদের উল্লেখ আছে 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে'। এখানে কৈবর্তদের কথা বর্ণিত আছে। গ্রন্থে কৈবর্তদের উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে— "বৈশ্যার গর্ভে ক্ষত্রিয়বীর্য হতে যে জাতি জন্মলাভ করে তার নাম কৈবর্ত।""

১। আনন্দ বাকচী 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ' দেশ, সাহিত্য শিরোনামে রচিত আশ্বিন ১৩৮৮। ২। 'ব্রহ্মবৈতবপুরাণ' ভাষান্তর সুধাংশু রঞ্জন ঘোষ তুলিকলম, ডিসেম্বর

১৯৯৮। বাংলার মৎস্যজীবী সম্প্রদায় গঙ্গার ব-দ্বীপ অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক অধিবাসী বলে দৃঢ় মত পোষণ করেছেন ডঃ ওয়াইজ। তাদের বিভিন্ন উপসম্প্রদায় গুলি

যথাক্রমে-

(ক) চাটগাও জালিয়া

(খ) ভুলুয়া জালিয়া

(গ) কালো জালিয়া

(ঘ) কৈবর্ত জালিয়া।

বাংলার মৎস্যজীবী বা জেলে জাতি কৈবর্ত জাতি থেকে এসেছে। এদের দুটি ভাগ ছিল (১) মেছো কৈবত ও (২) হেলে কৈবর্ত্য। মূলত মেছো কৈবত যারা, তারাই পরবর্তীকালে মাছ ধরার পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়। আর হেলে কৈবর্ত-রা চাষবাদ নিয়ে থাকে।

আমাদের আলোচনা বাংলা কথা সাহিত্যে জেলে সংস্কৃতি নিয়ে। সাধারণ অর্থে সংস্কৃতি হল কোনো সমাজের আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, রীতিনীতি, রুচি, সংস্কার, বিশ্বাস, ভাষা, চিন্তা ভাবনা, জীবন যাপনের ধরণ, জীবিকা নির্বাচনের পদ্ধতি প্রভৃতি উপাদান গুলি । জেলে সমাজ আজও সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণীর অন্তর্গত। সাহিত্যে তাদের কথা আসে কিছুটা পরে। যদিও উপন্যাস বা ছোটগল্প সাহিত্যের সম্পূর্ণ আধুনিক সামগ্রী। কিন্তু উপন্যাসে নিম্নবিত্তদের জীবনাচরণ আসে ধীরে ধীরে। বাংলা উপন্যাস তার প্রথম দিকের অভিজাত পরিমণ্ডল ছেড়ে কল্লোলযুগ বা তার কিছু পরে মৃত্তিকাকেন্দ্রিক জীবনধারা, বিশেষত নানা শ্রমজীবী মানুষের জীবনকথাকে তুলে ধরার প্রয়াস করেছিল, সেই প্রয়াসেরই হাত ধরে গল্প-উপন্যাসে জায়গা পেল বিশেষ বৃত্তিজীবী মানুষ। এদের সাথে এল ঘটনাবহুল, বিপদসংকুল ও সংগ্রামশীল জীবনে অভ্যস্ত জলনির্ভর জেলে সমাজ। জেলেদের ঘটনাবহুল জীবনের বিচিত্রতা লেখককূলকে আকৃষ্ট করেছে। তাদের কৌতূহলী মনকে উদ্রিক্ত করেছে। মৎসজীবীদের মাছধরায় একদিকে রোমাঞ্চ, অপরদিকে বিপদসংকুল-অনিশ্চিত জীবনের ভয়াবহতা, সাথে পুরানো সংস্কার নিয়ে বেঁচে থাকা, এসব কিছু নিয়ে জেলে জীবনের সংগ্রাম এসেছে নানাভাবে।

বিশেষ বৃত্তিজীবী জলনির্ভর জেলেসমাজ বাংলা কথা সাহিত্যে প্রথম আসে বিশ শতকের তিনের দশকে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬) হল বাংলা সাহিত্যের জেলে জীবনের প্রথম জীবন্ত দলিল। তারপরে মৎসশিকার ও মাছমারাদের জীবন কাহিনী নিয়ে আসে একাধিক রচনা। এই আলোচনায় মৎস্য আহরণকারী জেলে জাতির জীবনকথা নিয়ে রচিত কয়েকটি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করা হল-

প্রথম গ্রন্থ 'পদ্মানদীর মাঝি'। এই গ্রন্থে দেখা যায় জেলেদের মাথা গোঁজবার মতো স্থানের ব্যাপক অভাব, তাই অল্প জায়গায় ঠাসাঠাসি করে, গাদাগাদি করে অনেকগুলি ছোট বড়ো মানুষকে নিয়ে জেলেরা বসবাস করে। "জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ণ জীবনের স্বাদ এখানে ক্ষুধা, পিপাসা, কাম ও মমতায়, স্বার্থ সংকীর্ণতায় আর দেশি মদে।"* গ্রন্থে আরো দেখা যায়, এই মালো জাতির জেলেরা বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ায়, আবার প্রয়োজন মতো তা স্মরণ করাতেও ভোলে না, জীবনটা তাদের কাছে স্বচ্ছ তাই নিজের ভালো থাকাটা অন্যের কাছে প্রকাশ করতে ভাবে না, আবার কখনো বা অন্যের বিড়ম্বনায় তাকে রসিকতা করতে ও দু'বার ভাবে না। জীবনের আবেগ তাদের কাছে খুবই আপেক্ষিক। মহত্ব বা পরোপকার নয়, নীতি ও অপরিহার্য নিয়ম মেনেই কাটে তাদের জীবন। নানা সামাজিক বেড়াজালে আবদ্ধ তাদের জীবন। তাই তো পদ্মা নদীর মাঝি কুবেরকে মেয়ের বয়স এগারো পার হয়ে গেলে, তাকে বিয়ের বাজারে চলন সই করতে মেয়ের বয়স কমিয়ে বলতে হয়। পাশাপাশি অশিক্ষা ও কুসংস্কারের প্রভাবে তাদের ধারণা মেয়েরা পৃথিবীতে এসেছে সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য। তাই তাদের জীবন অস্বাস্থ্যকর আঁতুরঘর ও ঘরকন্নায় আবদ্ধ। তাদের পুরুষ সন্তানরা বড় হয়ে চলে যায় মাছ, ধরার কাজে, জেলের সঙ্গী হয়ে। পুরুষরা বউ আনে পণ দিয়ে।

এরা বাস করে নদীর আশে পাশেই, বর্ষার জলে বাড়ি গুলি তলিয়ে যায় কোমর জলের নীচে। মোটা বাঁশের ত্রিকোণ মাঁচা বেঁধে তখন এরা বাস করে। মানুষের পাশাপাশি গৃহপালিত পশু-পাখি গুলিও মাচায় স্থান পায়। ঝড় শুরু হলে ঘরে ঘরে মেয়েরা উঠানে পিঁড়ি পেতে ঝড়ের দেবতাকে শান্ত করার চেষ্টা করে।

জেলেদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায় গ্রন্থে। হিন্দু পরিবারে পর্দা প্রথা না থাকলেও মুসলমান পরিবারে এই নিয়ম ভীষণভাবে প্রবল। তাই মুসলমান মাঝি সে যত গরীবই হোক, মেয়েদের পর্দা অর্থাৎ লজ্জা ঢাকবার জন্য উঁচু করে বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করে। জেলেরা নিজেরা তাদের আকাঙ্ক্ষার জিনিস, পার্থিব বস্তু পাওয়ার জন্য মানত করে রাখে। ইচ্ছাপূরণ হলে হরির লুট দেয়। অবসরে নিজের মতো সময় কাটায় এই গ্রন্থের মাঝি। গ্রন্থে 'ভাসান যাত্রা'র বিবরণ পাওয়া যায়। অভিনেতাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, কাণ্ডজ্ঞান সব কিছুরই অভাব থাকে। তারা কোন পেশাদার দল নয়, আলু বেচা, তেল বেচা মানুষের শখের দল, অনেকে হয়তো পড়তেও জানে না, একে ওকে দিয়ে পড়িয়ে শুনে শুনে পার্ট মুখস্থ করে। তবু মনের টানে এসব কাজের মধ্যেই সুখ খুঁজে নেয়। আর কুবেরের মতো মাঝিরা এমন যাত্রাপালা দেখেই জীবনকে সার্থক করে। দুর্নীতি, দারিদ্র্য অন্তহীন সরলতার সঙ্গে নিচু স্তরের চালাকি, অবিশ্বাস ও সন্দেহের সঙ্গে অন্ধ ধর্ম বিশ্বাস, সহৃদয়তার সঙ্গে অধর্মকে

অনায়াসে সাথে নিয়ে চলা এসবই জেলেদের জীবনে একাকার হয়ে আছে। আর আছে প্রতিনিয়ত ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম।

পরবর্তী যে গ্রন্থে আমরা জেলের জীবন মরণ, নিয়ম কানুন, বেঁচে থাকার সংগ্রামের ছবি পাই তা হল সমরেশ বসুর 'গঙ্গা'। এই উপন্যাসে দেখা যায়। কচ্ছপ, কাঁকড়া, কলা এগুলি জেলেদের কাছে অশুভ যাত্রা। তারা বিশ্বাস করে ডাঙায়, জলে তুকতাক চলে। তারা ভয় পায় ডাঙার ডাকাতদের আর জলের কুমিরদের। এই গ্রন্থে জেলেদের মাছমারা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। মাছমারারা বলে—"মাছের চকের পিচনে ছোটা এক দুর্জয় টান। নেশার চেয়েও দামী জিনিস। তখন আর ঘর, গৃহস্থ, সামনে-পিছনে, কোন কিছু খেয়াল থাকে না। মনে থাকে না টাকার লালসা। আদিগন্ত সমুদ্রের ফোঁসানি, গর্জানি কানে ও ঢোকে না কারুর। চক ঘিরে পাটা জাল ফেলে, তুলে ফেলা নিয়ে কথা, সেই ফেলে তুলতে তুলতেই কতদূর টেনে নিয়ে যায় সমুদ্র কে জানে। সে খেয়াল হয় পরে।

মাছমারারা বিশ্বাস করে যারা সমুদ্রে আসে তারা চুল দাড়ি কাটবে না, কাপড়ও ছাড়বে না, করলেই অনাচার। তারা আরও মনে করে পাঁজি পুঁথি শাস্ত্রসম। জগতের সমস্ত কিছুই পাঁজির নিয়ম মেনে চলে। নদীতে কোন জেলে মারা গেলে কাশের মুণ্ড জট পাকিয়ে বেঁধে রাখতে হয়, যাকে বলে কশার। নতুন জেলে সেখানে গেলে জানতে পারবে, আগে সেখানে কোন মাছমারার মরণ হয়েছে।

এই মাছমারাদের উপাস্য দেবদেবীরা হলেন খোকা ঠাকুর, দক্ষিণরায় কবি প্রমুখ। এই সমস্ত দেবদেবীর পুজোতো তারা করেই, এছাড়া পালন করে চৈত্র শেষে সন্ন্যাস, আষাঢ়ে অম্বুবাচী, পৌষে পোড়া, চোতটোটা প্রভৃতি উৎসব। 'সাজোর' মাছমারাদের সর্বজনীন গঙ্গাপূজা। এই পুজাতে সব জেলেরা ইচ্ছাকৃত ও উৎসাহ সহকারে যোগদান করে। গুনীন, ওঝা, মন্ত্রপড়া মানুষজন তারা মাছমারাদের কাছে খুবই ভরসার পাত্র। তাদের ফুঁকই তো জেলেদের শারীরিক সুস্থতার অস্ত্র। উপন্যাসে দেখা যায় আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন এই চারমাস জেলেরা মন ভরে, প্রাণ জুড়িয়ে দু'বেলা খেতে পায় ও বাড়ির বাচ্চা, বুড়ো সবাইকে খাওয়াতে পারে। মাথায় মাখার তেল কেনার সামর্থ্য থাকে তাদের। বাকি মাস গুলিতে পেট চালাতে অভাবের তাড়নায় ফি বছর ঋণ নিতে বাধ্য হয় তারা মহাজনদের কাছে। বাঁধা পড়ে নৌকা, জাল এমনকি বাস্তুভিটে টুকুও। এক বছরের ঋণ শোধ হয় না, পরের বছরের জন্য নিতে হয় আবার চড়া হারে সুদ। এই ভাবেই দিন কাটে মাছমারাদের।

পরবর্তী গ্রন্থ 'তিতাস একটি নদীর নাম' অদ্বৈত মল্লবর্মণ লেখা এই গ্রন্থে শুরুতেই আছে নদীমাত্রিক বাংলার মৎস্যজীবী সম্প্রদারে জীবন রহস্য। 'তিতাস একটি নদীর নাম' এই গ্রন্থে তিতাস নদীকে কেন্দ্র করে একটি জেলে জাতির (মালো) জীবন থেকে মৃত্যু অবধি অবস্থার পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই। যদিও গ্রন্থটি তিতাস নদীর কাহিনী। কিন্তু পাশাপাশি তিতাস নদীকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকা এক শ্রেণীর মানুষ তাদের জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, উৎসব-বিশ্বাস সমস্ত কিছুই এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থেও দেখা যায় আষাঢ়, আশ্বিন এই কয়মাস জেলেদের সুখের সময়।

তারপর নদীতে জল জমতে শুরু করে আর শুরু হয় মালোদের অনটন। 'মাঘ-মণ্ডলের ব্রত' পালনের উল্লেখ আছে এই গ্রন্থে। মাঘ মাসের শেষ তারিখে কুমারী মেয়েরা সারামাস ব্রত পালনের পর নদীর জলে চৌয়ারি ভাসায়। সন্ধ্যায় কীর্তন গানের আসর বসে। কৃষ্ণমন্ত্রী-শিবমন্ত্রী দুই মতের লোক দেখা যায়। দোলের সময় রঙ মাখে। আনন্দ করে। শিবমন্ত্রী থেকে বোঝাই যায় তারা কালীপূজা করে। মালোরা কালীপূজোতে গ্রামের সবাই চাঁদা তুলে ধুমধাম করে পুজো পালন করে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তি অর্থাৎ পৌষমাসের শেষের দিন বাড়িতে আত্মীয় ডেকে লোক খাওয়ায়। পিঠে পুলি করে। সব শেষে খাওয়া দাওয়া সেরে নগর কীর্তন করে।

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এই তিনব্যাপারে মালো জেলেরা সামর্থ্য মতো খরচ করে। জন্মের পর অন্নপ্রাশন পালন করে কেউ কেউ ঘটা করে। জন্মের পর ছয় দিনের দিন জেলের মেয়েরা নতুন ছেলের ঘরে দোয়াত কলম দিয়ে যায় রাতে চিত্রগুপ্ত এসে নাকি দোয়াত থেকে কালি তুলে সেই কলমের সাহায্যে শিশুর কপালে তার ভাগ্যলিপি লিখে দিয়ে যায়। অষ্টম দিনে আট কলাই। তেরো দিনে অশৌচ অন্ত হয়। নাপিত দ্বারা জেলে পুরুষেরা দাড়ি কামায়। এই ধরণের বিভিন্ন সামাজিক নিয়মনীতি নিয়ে জেলেদের জীবন ধারণ।

এই গ্রন্থেই পাওয়া যায় নৌকায় মাছধরা জেলেদের থেকেই সরাসরি দোকানী ব্যবসায়ীরা মাছ কেনে। সেজন্য বিভিন্ন জায়গায় তারা চালা বেঁধে থাকে। মেয়েরা বঁটি নিয়ে কাতারে কাতারে বসে থাকে, পুরুষরা মাছের ঝুড়ি তাদের পাশে এনে রাখে। সেই কাটা মাছ অন্য দল নৌকায় করে নিয়ে চলে যায়। একে 'খলা বওয়া' বলা হয়। জেলে মেয়েরা অবসরে সূতো কাটার কাজও করে থাকে। বর্ষায় কাজের সময় কম। ভাদ্র আশ্বিন মাসের দিকে তাদের কাজের চাপ বাড়ে। বস্তুত দেখা যায় নিজেদের এই পেশার প্রতি তাদের অকৃত্রিম ভালবাসা। তাইতো বনমালীকে 'তিতাস নদী' শুকিয়ে যাওয়ার পর, কাঁধে মাছের হাঁড়ি নিয়ে গ্রামান্তরে যেতে দেখা যায়। গ্রন্থে আরও দেখা যায় এদের মধ্যে যারা শিক্ষিত হয়ে ওঠে তারা আর নিজের জাতির সঙ্গে আগের মতো মিশতে পারে না। ফলে একটা দূরত্ব তৈরি হয়। ফলত, এই 'তিতাস একটি নদীর নাম' গ্রন্থে আছে জেলেদের জন্মের ইতিহাস, মৃত্যুর বিরহ, বিবাহের সমারোহ সবকিছুই। কোন উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে আমোদ প্রমোদের কাহিনী, নেশায় ভান হয়ে কোন অসহায় মানুষকে পিটিয়ে মামার মতো নৃসংশ ঘটনা, নিজের স্বার্থে কোন গরীব জন-মজুরকে নদীতে নৌকা চাপা দিয়ে মারার গল্প, আবার কোন অনাথ শিশুকে সন্তান স্নেহে মানুষ করার কাহিনী, সন্তানকে নিয়ে দুই মায়ের নির্লজ্জ ইর্ষার ঘটনা। বস্তুত এ হল জেলে জাতির ইতিহাস। জল ছাড়া, মাছ ছাড়া অচল জেলে জাতির জীবনের ইতিহাস। অশিক্ষা, পড়াশোনার প্রতি অনীহা মালোদের যেন বৈশিষ্ট্য। তেরো-চোদ্দ বছরেই মেয়েরা যায় শ্বশুর ঘরে সংসার বাঁধতে আর ছেলেরা যায় নদীতে বা সমুদ্রে মাছ ধরতে। মাঝে মধ্যে এদের মধ্যেই কেউ কেউ এমন মানুষ এসে পড়ে যার ছোঁয়ায় সমাজে কিছু পরিবর্তনের স্বপ্ন মানুষ দেখতে চায়, কিন্তু বাস্তবের নিষ্ঠুরতায় তা স্বপ্নই থেকে যায়। যেমন 'জলপুত্র' উপন্যাসের দীনদয়াল চরিত্র।

হরিশংকর জোলাদাসের 'জলপুত্র' উপন্যাসটিতে ও ধরা পড়েছে জেলেদের অনিশ্চিত জীবনের গল্প। প্রকৃত পক্ষে জেলেদের এ এক অনিশ্চিত পেশা। যারা মাছের সন্ধানে বের হয় তাদের বাড়ি ফেরার না থাকে নিশ্চয়তা, কতটুকু উপার্জন নিয়ে ফিরতে পারবে তারও থাকে না কোন স্থিরতা, প্রাপ্ত বস্তুগুলি সঠিক দামে বিক্রি করে কোন লাভ হবে কিনা সে বিষয়েও কোন নিশ্চয়তা থাকে না, তবু যুগ যুগ ধরে এক শ্রেণীর মানুষ এই অনিশ্চিত জীবনকেই আপন করে নিয়েছে। অনান্য উপন্যাস গুলির মতো এই উপন্যাসেও দেখা যায় শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে স্বস্তির শ্বাস ফেলে জেলে ও তার পরিবার। এই সময় প্রকৃতিও উজাড় করে জেলেদের ভাণ্ডার পূর্ণ করে দেয়। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন এই কয়মাস তারা মন ভোরে খেতে পায়। নিশ্চিন্তে ঘুমায়, নতুন জামাকাপড় পরে। আর বাকি মাসগুলি অভাব অনটনের মধ্যে দিয়েই কাটে জেলেদের জীবন। বিশেষ করে ফাল্গুন-বৈশাখ জেলেদের বড়ই আকাল। এই সময় তারা দৈনন্দিন প্রয়োজনটুকুও মেটাতে সক্ষম হয় না। বড় জেলেদের মধ্যে যারা স্বচ্ছল তাদের জীবনটা অন্যরকম। তাদের নানারকম জাল (পেরিন, ঝাঁকি, হরি, টং, টাউঙ্গা, বিহিন্দি, কাটি) ও ছোট বড় নানা আকারের নৌকা আছে। ফলে তারা খুব বেশি সমস্যার মধ্যে পড়ে না। প্রকৃতপক্ষে পুরুষদের দ্বারাই সংসার চালিত হয় এই সমাজে, তাই যে সংসারে পুরুষরা অক্ষম, বা সংসার চালানোর মতো পুরুষ নেই, সেখানে মেয়েরা বিয়ারির কাজ করে অর্থাৎ মাথায় মাছের ঝাঁকা নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় মাছ বিক্রি করে তারা উপার্জন করে। ফাল্গুন-বৈশাখ এই সময়ে মাছের আকাল তাই মাছমারা বন্ধ রেখে ছিঁড়ে যাওয়া জাল সারায়। নতুন জাল বোনে। ফলে বিয়ারিরা যারা বড় বহদ্দারের উপর নির্ভরশীল তারা খুবই অসহায় হয়ে পড়ে। 'জলপুত্র' গ্রন্থে দেখা যায় জেলেদের অন্যতম প্রধান দেবী মনসা। যেহেতু জেলেদের কাজ জলে তাই সর্পদেবীকে তারা ভয় পায় ও পূজোর মাধ্যমে সন্তুষ্ট রাখে। শ্রাবণ মাসে জেলেদের ঘরে ঘরে মনসা পুঁথি পাঠ হয়।

এই সমাজে নিয়ম আছে জেলেরা মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হলে বারো বছর অবধি জলে রমনী সধবার জীবন যাপন করে। তারপর তারা বিধবার বেশ ধারণ করে। এই সমাজে আরো একটি নিয়ম ও চালু আছে ছেলে মেয়ে বড় হলে তারা সেই ছেলে মেয়ের বাপ বা মা নামেই পরিচিত হয়, নিজেদের পরিচয় আর থাকে না। মনসা পুজোর মতো সমাজে গুরুত্ব পায়—'গঙ্গাপূজা', চৈত্র সংক্রান্তি প্রভৃতি। চৈত্র সংক্রান্তির দিন ভোর বেলা প্রত্যেক ব্রতী জেলেনি তার সন্তানদের মঙ্গলকামনায় পূর্বমুখী হয়ে ভক্তি ভরে স্তূপীকৃত সংগ্রহে আগুন দেয় । একে বলে 'যাক দেওয়া; জেলে নারীদের চিরন্তন বিশ্বাস যাকের আগুনের ধোঁয়া সন্তানদের গায়ে লাগলে তাদের সমস্ত বিপদ- আপন দূর হবে।

জেলে সমাজে বিয়ের অনুমতির জন্য সভা বসে, এই সভাকে বলে 'পানছল্লা'। এই গ্রন্থে আমরা আরও দেখি গরীব জেলেরা মহাজনদের থেকে দুটি শর্তে ঋণ নেয়। মাসিক শতকরা দশ টাকা সুদে অথবা যত মাছ ধরা পড়বে, তার সবটাই দাদনদারদের নামে তাদেরই কাছে বিক্রি করতে হবে। আর একবার তাদের কাছ থেকে যারা ঋণ নেয়, তারা বংশানুক্রমে সে ঋণ থেকে মুক্তি পায় 'না। 'হাজা' হল এমনই একটি বাৎসরিক চুক্তি। মহাজনরা এই চুক্তি করানোর জন্য মরিয়া, আর দরিদ্র জেলেরা নিরুপায়। এই নিরুপায় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে প্রতিবাদে গর্জে ওঠা কণ্ঠ গুলি আবার বন্ধ হয়ে যায় জেলেদেরই নিস্তব্ধ ষড়যন্ত্রে। ফলে তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয় না।

১৯৮০ সালের প্রকাশিত সাধন চট্টোপধ্যায়ের 'গীহন গাঙ' উপন্যাসটি ও মালো তথা জেলে জাতির জীবনের প্রতিচ্ছবি। তিতাসের মালো পাড়ার সঙ্গে, কেতুপুরের মালো সংস্কৃতির সঙ্গে বেতনার মালো সংস্কৃতির কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উপন্যাসের শুরুতেই লেখক নিগৃহীত মাছ মারার ব্যর্থ জীবনকাহিনীকে তুলে ধরেনে। তাদের মধ্যে খুব কম মানুষই বার্ধক্যের সিঁড়িতে পৌঁছানোর সুযোগ পায় তার আগেই অপঘাত মৃত্যু এসে মালোদের গ্রাস করে। মালোজীবনে বসে খাওয়ার রীতি নেই, অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও মাছ মেরে জীবন নির্বাহ করতে হয়। একদিকে অরণ্যের ডাক অন্যদিকে ঘটিদার মহাজনদের দাদনের লোভ তার মধ্যে সুন্দরবনের বাঘের উপদ্রব — এভাবেই চলতে থাকে মালোদের জীবন চক্র। মালোজীবনে মৃত্যুর পালা— মালোসমাজ মেনে নিতে বাধ্য হয়। কারণ তাদের মতে ভাগ্যে যা লেখা থাকে তা খণ্ডানো মানুষের পক্ষে অসাধ্য। ঔপন্যাসিকের মতে "মালোসমাজের অন্যনাম বিধবা পল্লী। মালোদের মধ্যে এমন কোনো পরিবার নেই যাদের কোনো বউয়ের দেহে কালো পাড়ের থান ওঠেনি, শোকের শেল তোলেনি হাহাকার। এমন কোনো কুটির নেই যার বড় ছেলে অশৌচ পোষাকে খুটিদার, মহাজনদের পায়ের তলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টার বদলে দু'দশ টাকার সাহায্য পেয়ে সুদের গভীর বন্ধনে জড়িয়ে পড়েনি। ঘটিদার ও মহাজনের কুচক্রান্তে মালোরা কোনদিন স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারে না । মালোরা জানে দাদন, সুদ, সাহায্য, রিলিফ ছাড়া জীবন নির্বাহ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। জঙ্গলে আপনজন হারিয়ে কুশপুত্তর পোড়ানোর রীতি আছে মালো সমাজে। এই রীতি দীর্ঘকালের। তাদের রীতি অনুসারে, যে গরীব মানুষের অপঘাতে মৃত্যুর পর বাড়ির মানুষের অশৌচ পালনের ক্ষমতা থাকে না, তারা অপেক্ষা করে থাকে, যখন পয়সা জোটে তখন খড় বা কলাগাছ নিয়ে মৃত মানুষটির কুশপুত্তুর বানিয়ে নদীর চড়ায় পুড়িয়ে একমাস অশৌচ পালন করে। সে অনুষ্ঠানে কম করেও হাজার টাকা লাগে আর সেভাবেই সুদের গভীর বন্ধনে তারা জড়িয়ে পড়ে। সুদ ও তস্য সুদ বারবার মালোদের মনে করিয়ে দেয় লোকটা মরল, সঙ্গে মেরে গেল গোটা পরিবারকে। এই তাদের চিরাচরিত সংস্কার। এই সংস্কার ও বিশ্বাসের বিপরীতে যে বা যারা যেতে চায় তাদের উপর ঘনিয়ে আসে মহাজনদের চক্রান্তের সাঁড়াশি চাপ। কিন্তু তারপরও এদের জীবনে আসে নানা খুশির মুহূর্ত। যদিও তা প্রকৃত খুশির মুহূর্ত নাকি সামাজিক রীতি, তা নিয়ে সন্দেহ থাকে। কারণ যে কোন খুশির মুহূর্ত মানেই টাকার খরচ। ভাই মালো স্ত্রীপনকে নবজাতকে ছা জন্য ভাবতে হয়। এই ছয়ষষ্ঠীর রাতেই ভাগ্যদেবী ছেলের ললাটে সমস্ত জীবনের শুভ-অশুভের বিধান লিখে দেবেন। ছয়ষষ্ঠী উপলক্ষ্যে বড় ঠাকুরের পুজো হবে। পাড়ার এয়োরা ব্রত পড়বে, প্রসাদ খাবে সবাই। আর এসবের জন্য চাই টাকা। অনন্যোপায় হয়ে বাড়ির স্ত্রীলোকের গয়না বন্ধক রেখে দোকান হার্ট করা এ সমাজের রীতি। এসব অনুষ্ঠানের মধ্যে তারা যেন জীবনের স্বাদ খুঁজে পায়, আত্মতৃপ্তি পায়। এই মাটি ঘেঁষা জেলে মাঝিরা একত্রিত হয়ে ব্রত পাঠ আর পূজা অর্চনা করে নবজাতকের শুভকামনায়। কিন্তু মালোদের সব স্বপ্ন আশা ধূলিসাৎ করার জন্য আছে মহাজনরা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মালোমাঝিরা তাই বাধ্য হয় অপঘাতে মৃত্যুর পথকে গ্রহন করতে। তাদের সামনে আর কোন পথ যে নেই।

মানিক বন্দ্যোপাধধ্যায়র যে নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস ধারায় সূত্রপাত করেন সেই ধারাকে অব্যাহত রেখে সাধন চট্টোপাধ্যায় ১৯৮০ সালে প্রকাশ করেন 'গহিন গাঙ' আধিপত্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় দারিদ্র্য লাঞ্ছিত, নিপীড়িত মালোদের জীবন সংগ্রাম ও সমকালীন সমাজ বাস্তবতার যে ছবি লেখক এঁকেছেন তা

বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। সমগ্র আলোচনার মধ্যে দিয়ে ও উপন্যাসগুলির মধ্যে দিয়ে জেলে জাতির নির্মম বাস্তবতা ফুটে ওঠে। দেখা যায় জেলে জাতি মূলত অশিক্ষা, কুসংস্কার, নানা ভ্রান্ত ধারণা, ধর্মীয় নানা বিশ্বাস, রীতি-নীতির নাগপাশে আবদ্ধ, ঋণে জর্জরিত এক জাতি। বিধাতার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও পেশার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা নিয়ে, কঠিন জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে করতে তারা নিজেদের অস্তিত্বকে রক্ষা করে চলেছে।

সূত্র নির্দেশ :

১. আনন্দ বাগচী : অদ্বৈত মল্লবর্মন, দেশ, সাহিত্য শিরোনাম রচিত, আশ্বিন ১৩৮৮

২. ঘোষ সুধাংশু রঞ্জন (ভাষান্তর) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' (ব্রহ্মখণ্ড), ডিসেম্বর ১৯৮৮, তুলিকলম, কলকাতা–৯

3.বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, 'পদ্মানদীর মাঝি', আগস্ট ২০১০, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা–৭০০০৭৩

৪. বসু সমরেশ, 'গঙ্গা', আগস্ট ২০১১, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা–৯

৫. মল্লবর্মন অদ্বৈত, 'তিতাস একটি নদীর নাম, জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস, কলকাতা – ৭০০০৭৩

৬.জোলাদাস হরিশংকর, 'জলপুত্র' জানুয়ারি ২০১৩, বইমেলা,কলকাতা – ৭০০০৭৩

৭.দাস নীতিশ, সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহিন গাঙ' উপন্যাসে মাটি ঘেষা মানুষের জীবন সংগ্রাম।